সম্পাদকীয়

আমাদের অতীতের সুখ-দুঃখ, বিষাদ-বৈভব, আর আমাদের ভবিষ্যতের আশা-নিরাশা, সংগ্রাম-স্বপ্ন, আর এই দুই কালের মাঝখানে আমাদের যা চিরমধ্যক্ষণ, তার ধ্যান-ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ— এইসব কিছুর মধ্যেই আমাদের শিকড়, এইসব কিছুর দিকেই আমাদের বিস্তার।

মানুষের জীবন চিরকালই এক দীর্ঘ দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাত্রা, অধরা সুসময়ের উদ্দেশে। কালের সেই আলেখ্যও আমাদের আগ্রহের বিষয়। চারদিকের অবিরাম আলোকবাজি, অট্টহাসি, উন্নয়নের বিপুল জাঁকজমক, বিজ্ঞাপনের বর্ণাঢ্য আলেয়া ফুঁড়ে-ওঠা মানবজীবনের মর্মস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস আমাদের ভাষায় কোথায় কীভাবে ছায়া ফেলছে, ফেলছে কিনা, হয়তো তা-ও ভাববার বিষয়। তাছাড়া, আমাদের কূপমণ্ডুকতার ধারাবাহিক আনন্দ ও অভ্যাস নিয়ে আত্মসমালোচনারও প্রয়োজন।

আমাদের নতুন পত্রিকা এইসব কিছুতেই জড়ানো। এইসব কিছু থেকেই সে তার নিজের গড়ন পাক।

'কালের কষ্টিপাথর' একদিকে গতকাল, সমকাল ও আগামীকালের মধ্যে এক সঞ্জীবনী সেতুবন্ধনের চেষ্টা, অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দিকে শ্রদ্ধা ও সংশয় নিয়ে তাকানো।

'কালের কষ্টিপাথর', ২ জুলাই, ২০১২

সম্পাদকীয়

আজকাল সাহিত্য নিয়ে আমার মনে নানান দার্শনিক ভাবনা আসে। সাহিত্যের ব্যস্ত লেখক হলে হয়তো ভাবতাম না। সাহিত্যের পাঠক বলেই না ভেবে পারি না।

আমার সামান্য জীবনের আরও সামান্য অভিজ্ঞতায় দেখেছি মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় সাহচর্য নির্মল প্রকৃতি।

সমাজ-সংসার যতটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা বা প্রগতি ভালোবাসা।

সাহিত্যে এই সবই মেলে, হয়তো সেইজন্যই সাহিত্য আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় শুশ্রূষা।

প্রকৃতির গায়ে যদি ক্রমাগত দূষণ লাগতে থাকে, ভালোবাসায় যদি হীনতা-থেকে-আরও-হীনতার আঁচড় লাগতে থাকে, তখন সাহিত্য আমাদের জীবন শেখায়। শেখায় দুঃখভার বইতে।

শেখায় অন্ধকার সইতে। শেখার আলোর কথা কইতে। কিংবা হয়তো তাও নয়, সাহিত্য আসলে আমাদের তৃষ্ণার জল, হয়তো তপ্ত হৃদয়ে শীতল প্রলেপ, শেকাচ্ছন্ন মনে সান্ত্বনার ছোঁয়া। হয়তো স্বপ্নের সংকেত। হয়তো বিষাদের বীজবপন। হয়তো সেইজন্যই সাহিত্যের শিকড় জীবন-আঁকড়ানো। সাহিত্য আমাদের সুখ-দুঃখের অতল-ডুবুরি।

যখন দেখি 'আমাদের যুগ ক্রমেই ইতর হইয়া আসিতেছে', যখন দেখি 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ', যখন দেখি 'সত্যের ওপর চলে গণভাঙচুর' তখন মনে হয় সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় কখনও পুরনো হয় না। শুধু ভাবা নয়, সে-ভাবনা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াও হয়তো দরকার। 'কালের কষ্টিপাথর' সর্বান্তঃকরণে এই ভাবনা বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠতে চায়।

'কালের কষ্টিপাথর', ২ সেপ্টেম্বর, ২০১২

কথার সত্যি কথার মিথ্যে

আজকাল ক্ষমতাসর্বস্ব দোর্দণ্ডপ্রতাপ দলীয় রাজনীতির মারাত্মক মিথ্যাচার আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরের মৃদু 'ইতি গজঃ'ও রাজনৈতিক বা সমরনৈতিক মিথ্যাশ্রয় সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাকাব্যের মহানায়কের গলার স্বরে হিংসার ছোঁয়া ছিল না, বলার ভঙ্গিতে ছিল না হিংস্রতার ছায়া। আর একালের অনর্গল বাক্যবর্ষণ কৃষিপ্রধান, নদীমাতৃক ভারতীয় জীবনধারায় তো শোনাই যাবে না।

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। ক্ষমতা পেতে বা ধরে রাখতে অতি-রাজনীতির এই যুগে নেতা-নেত্রীদের বেশি কথা হয়তো বলতেই হয়। মিথ্যে কথাও তার অনিবার্য অঙ্গ। আদালতের কাঠগড়ায় 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না'— কথাটাই তো আমাদের স্বার্থান্ধ জীবনযাপনে তার সবটুকু সত্য-ভার খুইয়ে ফেলেছে। কিন্তু 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর' তিন শতাব্দী পেরিয়ে এসেও কবির এই কথা আজও সত্য বলেই চেনা যায়।

তার কারণ কবি কখনও মিথ্যে বলে না। কবিতায় মিথ্যে লেখা যায় না। রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পেশাদার বা সাংসারিকদের মতো, এমনকি তাদের একজন হয়েও, কবি তার কবিতায় মিছে কথা লিখতেই পারে না। স্বপ্নে বা কল্পনায় কি মিথ্যে বলা যায়? কবির লেখায় ভুল থাকতে পারে, মিথ্যে কখনওই না।

'আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে একটাও সত্যি বলেনি/চিতা জ্বলে ওঠো'— এ কি কোনও রাজনীতিক বলতে পারবেন?

কবি-সাহিত্যিকের এই সত্যনিষ্ঠা আমরা যত বুঝব, ততই জীবনের স্বরূপ খুঁজব। কবিকে যত সম্মান করব, তত সমাজের সুষমা, যত মানব, ততই মঙ্গল। মন দিয়ে মহাভারত পড়লে জীবনের মহামন্ত্র লাভ হয়ে যায়।

'পুলিশ!/কবিকে দেখলে টুপিটা তোর খুলিস।' তুষার রায়ের রক্ত-যন্ত্রণার ফিনকি-লাগা হালকা হাসির ছদ্মবেশী এই আর্ত দাবি কি দিনে দিনে আরও বেশি

সত্যি হয়ে উঠছে না?

জর্জিয়ায় রাজধানী ৎবিলিসিতে রাইটার্স ইউনিয়নের এক সভায় আলাপ হয়েছিল লতায়-পাতায় রাজবংশের উত্তরপুরুষ, আশি বছর বয়সি কবি ছাবুয়া আমিরেদাজিবির সঙ্গে। গুন্টার গ্রাস যেবছর নোবেন পুরস্কার পান— সে-বছর নোবেল মনোনয়ন-তালিকায় তিনিও ছিলেন। গলায় ক্যান্সার, অপারেশনের পরও দিনে দশ-পনেরোটা সিগারেট খান, জোর দিয়ে কথা বললেও মনে হয় ফিসফিস করে বলছেন— আমার সঙ্গে আলাপের শুরুতে তাঁর ভিজিটিং কার্ড দিলেন, তাতে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন—

শাসক নিক্ষেপকারী
সর্বকালের সব মানুষের
সবচেয়ে চড়া সুরের গায়ক

আবার, রাজধানী থেকে দেড়-দুশো কিলোমিটার দূরে জর্জিয়ার মহাকবি শোতা রুসতাভেলির অষ্টশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উৎসবে ভারতীয় আমাকে পেয়ে দেড়-দুশো কবি যখন পানাহারের আনন্দে উচ্ছ্বাসে গেয়ে ওঠেন— 'মহাকাব্যের দুই দেশের কবিতার জয় হোক, কবিদের জয় হোক' ইত্যাদি— তখন আমার মন আশায় ভরে যায়।

ওই বাক্যের শেষ তিনটি শব্দ কল্পনার স্বর্গরাজ্যের চূড়ান্তে পৌঁছে ঘোষণা করে— 'কবিরাই সরকার গড়ুক'।

জর্জিয়ার কবিদের এই আবেগ যতটা অবাস্তব, ততটাই সত্যি। যতটা অসম্ভব, ততটাই আন্তরিক।

যতই উদ্ভট শোনাক, দু'মাস আগের কষ্টিপাথরে খোদিত মোঙ্গোলীয় কবির এই বাক্যটি বিশ্বাস করতেও কি ব্যাকুল হবেন না যে, 'মানুষ যদি কবিতা চূড়ান্ত আয়ত্ত করতে পারে/শয়তান আর রাক্ষসের ভীতির কারণ হবে সে'। কথাটার জোর বহু যুগের ওপার থেকেও শোনা যাবে!

এ হল সত্যের জোর, সেকালের এক কবির মনে যার জন্ম। একালের রাজনীতির নেতা-নেত্রীদের কথায় এই সত্যের জোর থাকে না কেন, তাঁদের যত জোর শুধু গলার?

জর্জিয়ার সুরাসিক্ত কবিদের মতো আমার মনেও একটা স্বপ্নরাষ্ট্র আছে। সেই কল্পরাজ্যে রাজনীতির রথী-মহারথীরা কবিকে বেতনভুক বা উপঢৌকনমূক সভাকবি না বানিয়ে শিক্ষক হিসেবে বরণ করে নেবেন। জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-ভালোবাসার নিত্য পাঠ নেবেন কবিতার কাছে নতজানু হয়ে।

কেননা কবিতা মিথ্যে বলতে জানে না। স্বার্থ চেনে না। কবিতা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

'কালের কষ্টিপাথর', ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সম্পাদকীয়

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তখনকার এক তরুণ কবি, পরে যিনি স্বনামধন্য বিশ্বতোমুখ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত হয়ে উঠবেন, আরেক তরুণ কবি-ঔপন্যাসিক, সাহিত্যে তখনও তিনি বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশিত নন, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনার কাছে একটি গল্প চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারব। এবং সেই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু যা দেখছি তাতে মনে হয় সে রকম সাহিত্যপত্রে বাংলাদেশের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।'

এমন কত তরুণ হেরে গিয়ে বা হতাশ হয়ে শেষ অব্দি তার স্বপ্ন ত্যাগ করেছেন, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসেও তার ইঙ্গিত মেলে। অঙ্কুরেই নষ্ট বা পরাজিত বা এমনকি অজাত সেইসব স্বপ্নের আঁকিবুকি কেউ যদি খুঁজে আনেন বা তাদের জীবাশ্ম সন্ধানে যান সেখানেও হয়তো বাঙালির মন ও মননের ডানা ঝাপটানো দেখা যাবে।

ছোট ছোট এইসব স্বপ্নভঙ্গের একটা বড় কারণ সাহিত্যের বাজার। তার চাহিদা-জোগানের নিয়মের রাজত্ব। বিশেষ করে বিনোদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপরীতে গিয়ে গণরুচিকে যা প্রশ্ন করে, প্রভাবিত করতে চায়, তাকে টিকিয়ে রাখার মতো জনবল ধনবল এবং হয়তো-বা রুচিবল আমাদের সমাজে খুবই দুর্লভ। 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এবারের 'পুরনো অ্যালবাম'-এ অর্ধশতকেরও আগের একটি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের সকরুণ খেদ আজও তাই কিছুমাত্র পুরনো মনে হয় না। এ যেমন সত্যি, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় তা নিয়ে তেমনই আক্ষেপ করারও হয়তো কোনও সার্থকতা আর নেই। বিশেষ করে এখন যখন অনেক ছোট কাগজ সাহিত্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। ছোট ছোট কাগজে অনেক নতুন কবি তাদের নতুন ভাষা নিয়ে জেগে উঠছেন।

আবার এত বড় একটা ক্ষোভের বিষয় সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে নতুন সাহিত্যপত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাও খুব বেশি এগোয় না।

প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের পাতা ভরানোও এক কঠিন কাজ। প্রতি মাসেই এই লেখা লেখবার সময় আমার কেবলই মনে পড়ে যায় এজরা পাউন্ডের A B C Of Reading বইয়ে সাহিত্যের মাস্টারমশাইয়ের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলা সেই কথাটা যে, অনেকদিন ধরে চিন্তা ভাবনা করলে সাহিত্য নিয়ে হয়তো দুটো-একটা কথা বলা যায়, কিন্তু সাহিত্যের শিক্ষকদের ট্র্যাজেডি— ক্লাসে রোজই লম্বা সময় তাঁদের কথা বলে যেতে হয়।

হুবহু উদ্ধৃতি নয়, স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আসা কথার টুকরো।

এতদিন পরে, ক্ষীণভাবে হলেও, মনে আছে হয়তো এইজন্যও যে মাসে মাসে এই পাতাটা লিখতে গিয়ে সম্পাদকের একই দুর্দশা ঘটে।

একটাই সান্ত্বনা। বাজারের জলহস্তি-হা হেলায় উপেক্ষা করে 'কালের কষ্টিপাথর' জন্মের প্রথম বর্ষটি প্রায় পূর্ণ করতে চলেছে। বাংলাভাষায় এখন আর 'বঙ্গদর্শন' বা

'বিচিত্রা' নেই, সেইসব যুগই আর নেই, এই অবস্থায় আরও বেশি সংখ্যক বাঙালিকে সাহিত্যমুখী করতে ছোট কাগজের চেয়ে বড়, বাজারনিয়ন্ত্রিত বড় কাগজের চেয়ে ছোট এই সাহিত্যপত্রিকা কতটা নিজের মতো করে বাড়তে পারে সেটাই এখন দেখবার।

'কালের কষ্টিপাথর', মার্চ ২০১৩

সম্পাদকীয়

জীবন মূলত স্মৃতিপুঞ্জ, মন মূলত চিন্তাস্রোত— আর এই দুই তথ্যের সঙ্গে যদি জোড়া যায় বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থের নাম— সংবাদ মূলত কাব্য, তাহলে সাহিত্যপাঠকের কাছে তার জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে আনাগোনা বা মৌলিক বিনিময় ঠিক কী ধরনের হতে পারে?

তার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে স্পন্দিত পরিপার্শ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েনে তার জীবনানুভব ও সাহিত্যপাঠ পরস্পরের সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক বা পরস্পরের পরিপূরক?

সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের মধ্যে কি কোনও বোধের বিনিময় ঘটে? সমকালীন বাংলা উপন্যাসের এক চিরকালীন মহাস্থপতি সম্প্রতি এক ভিন্ন প্রসঙ্গে আমাকে এস এম এস-এ বলেছেন, 'বিনিময় সব সময়ই উপকারী।'

সাহিত্য কি পাঠকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপকারী হয়েই যুগে যুগে বেঁচে আছে ও থাকবে? তার চেয়ে বড় সার্থকতা শুধু সাহিত্যেরই নয়, মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে!

'কালের কষ্টিপাথর', ডিসেম্বর ২০১৪